গলফ ক্লাব রোডে একটা দোতলা বাড়ির নিচতলাটা ভাড়াতে নেন জ্যোতির্ময়, ছেড়ে দেন কবিতা ভবন এবং নাকতলার শ্বশুরালয়। নতুন বাড়িটিতে একটা ইংরেজির 'এল' অক্ষরের আকারের বিশাল বসার ঘর, দুটো শোবার ঘর, একটা রান্নাঘর, অবিসংবাদিতভাবে বাথরুম-টইলেট, এবং দুটো শোবার ঘরের মাঝখানে লোভনীয় গ্রীনরুম ধরনের একটা ছোট্ট ঘর। একটা শোবার ঘরে থাকেন জ্যোতির্ময় এবং মীনাক্ষী, অন্যটায় তিতির এবং গোগো। মাঝখানের ছোট্ট ঘরে রাখা হয়েছে ড্রেসিং টেবিল, জামাকাপড়, বইপত্র, বাক্স। বাড়ির চারপাশে এক বর্গমাইল জায়গা অধিকার করে আছে সবুজ। সবুজের মাঝে পাখির হইচই, তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ভাল-খারাপের সাগরসমান ভাণ্ডার। জ্যোতির্ময় দত্ত এত পাখি এযাবৎ কোন পাখি-অভয়ারন্যেও দেখেননি। বাড়িটি অনেক স্মৃতি দিয়েছে। স্মৃতি মধুর হলেও মধুর, তিক্ত হলেও মধুর। সাধারণ মানুষ জীবনকে নির্বিবাদে কাটিয়ে দিতে চায়। তাদের জীবনেও সাফল্য, সুখ, শান্তি সবই আকাঙ্ক্ষিত। তারা চায় সোজা পথের মসৃণ রেখা ধরে সেসব আসুক। পথে বাধা এলে তাকে সরানোর চেষ্টা না করে হয় তারা হতাশ হয়ে থেমে যায় নতুবা বিকল্প পথের সন্ধান করে। সেই বিকল্প পথ তাদের পুরোপুরি হতাশ হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিলেও পরম শান্তি দিতে ব্যর্থ হয় । থেমে যাওয়া অথবা বিকল্পকে আশ্রয় করে বাঁচা দুর্বলদের ধর্ম। যাঁরা বলিষ্ঠ মনের অধিকারি তাঁরা সংগ্রাম করে, প্রতিবাদ করে সুখ পান। ব্যক্তিস্বার্থে তাঁদের সংগ্রাম, জনস্বার্থে তাঁদের সংগ্রাম। স্মৃতি তাঁদের কাছে সর্বদাই মধুর।

কলকাতা পত্রিকার জন্মের পরপরই বের করা হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, বসুর ষাটতম জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করে। প্রকাশনার কাজ যে সর্বদা খুব মসৃণ পথ ধরে চলছিল তা নয়। টাকার অভাবে, সময়ের অভাবে অনেক সংখ্যাকে চেপে দিয়ে হচ্ছে। উত্থান-পতনের মাঝে ডলফিনের জলের উপরিতলে এসে শ্বাস নেওয়ার মত পত্রিকা লম্বা শ্বাস নিয়েছে বিশেষ বিশেস সংখ্যা প্রকাশনার মাধ্যমে। সত্যজিৎ রায় সংখ্যায় বেরিয়েছিল তাঁর জীবনের দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার। পরিচালকের জীবন কাহিনী লিখতে গিয়ে কৃষ্ণা দত্ত এমনই এক অভিমত দিয়েছেন। সাক্ষাতৎকার পত্রিকার অধিকাংশ পাতা দখল করে ছিল এবং অনুপ্রাণিত করেছিল প্রতিভাসকে পত্রিকা থেকে পাতাগুলি তুলে নিয়ে বই প্রকাশ করতে। ১৯৭৪এ বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিতে আরও একটি সংখ্যা বের করেছিলেন জ্যোতির্ময় দত্ত।

কলকাতা পত্রিকা মোটের ওপর আর দশটা পত্রিকার সঙ্গে একই তালিকায় নাম লিখিয়ে ফেলতে পারত কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রি ইন্দিরা গান্ধি তা হতে দিলেন না। ১৯৭৫ সালে ২৫শে জুন রাতে ইন্দিরা গান্ধি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ঘোষণা করলেন, 'রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।' প্রধানমন্ত্রী মূলত তিনটি স্বার্থের ভিত্তিতে এই কঠোর সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে দাবি করেন। প্রথমত, জয়প্রকাশ নারায়ণ দ্বারা চালিত আন্দোলনের কারণে ভারতের সুরক্ষা ও গণতন্ত্র বিপদগ্রস্ত। দ্বিতীয়ত, ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নের প্রয়োজন। তৃতীয়ত, বিদেশ থেকে আসা শক্তিগুলি যা ভারতকে অস্থিতিশীল ও দুর্বল করতে পারে তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক হওয়া। আসল কথাটা হল গান্ধি ক্ষমতা হাতছাড়া করতে চান না। জরুরি অবস্থার ঘোষনা জ্যোতির্ময়ের আধ্যাত্মিক উদাসীনতা একেবারে ঘুচিয়ে দিল। তিনি সোচ্চার প্রতিবাদী রূপে পুনর্জন্ম নিলেন।

কেড়ে নেওয়া হল নাগরিকদের বাক্‌স্বাধীনতা। আদেশ হল প্রেসগুলোকে সেন্সর করার। ইতিহাস আমাদের বলে যে একা শাসক দায়বদ্ধ নয়, কেউ এমন যে স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের কাছে পরাজিত হয় সেও একইরকম দোষী। গনতান্ত্রিক ভারতবর্ষে প্রতিবেশি পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মত একনায়কতন্ত্র চলবে এটা ভাবাই যায় না। সংবাদপত্র, পত্রিকার ওপর সরকারি প্রহরতা চাবুকের প্রহারের চাইতেই ভয়ংকর, বেদনাদায়ক। জ্যোতির্ময় হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড-এ সম্পাদকীয় লেখেন। সেন্সরশিপের ধ্বজা নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এর কলমচিরা তাঁর লেখার ওপর ফোঁপরদালালি শুরু করলে তিনি খেপে গেলেন, সাংবাদিক হিসেবে নিজের মান রাখতে বেশ কয়েক রাত না ঘুমিয়ে ঠিক করলেন এর প্রতিবাদ করতেই হবে। তিনি একটা খোলা চিঠি লিখলেন কিন্তু কোন সংবাদপত্র তা ছাপতে রাজি হবে না ভেবে ঠিক করলেন প্রচারপত্রের মত করে বের করবেন এবং বিলি করবেন। প্রচারপত্রে শুধু জ্যোতির্ময় দত্তের নাম থাকলে তা বেশি গুরুত্ব পাবে না। আর কার নাম যোগ করা যায় ভাবতে ভাবতে দু'জনের কথা তাঁর মাথায় এল—হামদি বে এবং গৌড়কিশোর ঘোষ।

কিন্তু...কিন্তু 'হামদি বে'র কাছে গিয়ে কোন লাভ হবে না। কাছের মানুষ হয়েও তিনি তাঁর বিশ্বাস নিয়ে অনেক দূরের। পাণ্ডিত্য এবং পানাসক্তি—'হামদি বে'র চরিত্রের এই দুটো দিক নিয়ে তাঁর মৃত্যুর পরে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন—যেমন সাংবাদিক জগতে তিনি ছিলেন বিশ্বকোষ, মদ্যপানে ক্যাপ্টেন হ্যাডক। হামদির স্বতন্ত্রতা ছিল অন্যত্র। আত্মবিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাস দ্বারা নির্দেশিত পথ ধরে জীবন যাপন করার দুর্লভ সাহস। তাঁর এই বিশ্বাস জন্মেছিল সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে র‍্যাডিক্যল হিউম্যানিস্ট হিসেবে পরিচিত 'মানবেন্দ্রনাথ রায়'এর সান্নিধ্যে আসার পর। বে জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করছেন।

জ্যোতির্ময় গৌড়কিশোর ঘোষের কাছে গেলেন। 'গৌড়দা, তুমি কি এই ইস্তাহারে নাম দিতে রাজি?' গৌড়কিশোর জ্যোতির্ময় দত্তের কাছ থেকে ইস্তাহারের লেখা চেয়ে নিলেন। তাঁর বক্তব্য ইস্তাহারের মাধ্যমে সরকারের ওপর বেশি চাপ ঢালা যাবে না। ইস্তাহার হারিয়ে যাবে। তিনি বললেন, 'প্রতিবাদের অন্য কোন উপযুক্ত উপায় ভাবো।' পরদিন জ্যোতির্ময় গৌড়কিশোরের বাড়িতে আবার যান, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি কলকাতা পত্রিকার রাজনীতি সংখ্যা বের করব।' এতদিন পর্যন্ত কলকাতা পত্রিকার জন্ম হয়েছে রাজনীতি সংস্রব বহির্ভূত সংবাদের গর্ভ থেকে। এইবার তার প্রস্তুতি শুরু হল রাজনৈতিক গর্ভ থেকে সংবাদ পরিবেশনের। পত্রিকার পেছনের প্রচ্ছদে জ্যোতির্ময় এঁকেছিলেন ধুতি ও ফতুয়া পরা গৌড়কিশোরের ছবি। সামনের প্রচ্ছদে ছিল গেরুয়া-লাল রঙের উপর সবুজ ও টকটকে লাল দিয়ে লেখা কলকাতা, বিশেষ রাজনীতি সংখ্যা, বর্ষ ১৯৭৫। ভেতরের পাতায় সম্পাদকের নাম—জ্যোতির্ময় দত্ত, সহসম্পাদকের নাম—শুম্ভু রক্ষিত এবং প্রকাশকের নাম—প্রকাশ বসু। প্রকাশ বসু অধিক খ্যাত ছিলেন 'আকুলদা' নামে। তিনি ছিলেন জ্যোতির্ময় দত্তের সমস্ত রকম দুঃসাহসিক কাজের সঙ্গী।